আলো
পহর
এপ্রিল-জুন ২০১৪, চতুর্থ সংখ্যা
এমএলই নিউজলেটার

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) ফোরাম-এর ২৮তম সভা

গত ২২ এপ্রিল ২০১৪ বিকাল ৩.০০টায় গণসাক্ষরতা অভিযান সম্মেলন কক্ষে 'এমএলই ফোরাম'- এর ২৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের আহবায়ক ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার, এমএলই ফোরামের সদস্যবৃন্দসহ মোট ১৯জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবি কর্তৃক এমএলই কার্যক্রমের অগ্রগতি, এমএলই বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজন ও এমএলই নিউজলেটার 'পহর' প্রকাশনা বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. গোলাম মোস্তাফা, উপদেষ্টা-ইসিডি, আগা খান ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫টি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের জন্য লেখক নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত নামের তালিকা গ্রহণ করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এমএলই বিষয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া এখনই শুরু করা দরকার বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ বিষয়ে এমএলই ফোরাম থেকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। খসড়া প্রস্তাবনা উন্নয়নের জন্য সভায় একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট এলাকার আদিবাসী জনগণসহ স্থানীয় প্রশাসনকে এমএলই বিষয়ক সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে অবহিত করা এবং এতে আদিবাসী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে সভা-সেমিনার আয়োজনের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সভা সেমিনারের মাধ্যমে এলাকার আদিবাসীরা এমএলই বিষয়ক সরকারি সিদ্ধান্ত, বাস্তবায়ন কৌশল, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারবে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। আঞ্চলিক সেমিনার আয়োজনের ক্ষেত্রে এমএলই ফোরামের যে সকল সদস্য সংস্থা যে সব এলাকায় কাজ করে সেখানে সেমিনার আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে এবং এমএলই ফোরাম ও সদস্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আঞ্চলিক সেমিনারসমূহ আয়োজিত হতে পারে বলে সভায় অংশগ্রহণকারীরা অভিমত প্রকাশ করেন।

এমএলই নিউজলেটার 'পহর' বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আদিবাসী লেখক-গবেষকসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে একটি চাহিদা নিরূপণ সভা আয়োজনের জন্য সভায় গণসাক্ষরতা অভিযানকে অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে অবিলম্বে একটি সভা আয়োজনের সুপারিশ করা হয়।

চা-বাগান এলাকার বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার জন্য সুপারিশমালা

চা-বাগান এলাকা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের নিয়ে **এডুকেশন ওয়াচ**-এর পক্ষ থেকে একটি গবেষণা করা হয়েছে। এই গবেষণায় উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করা হলো। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও চা-বাগান এলাকার শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে নিচের নীতিসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. বিশেষ করে চা-বাগান এলাকায় এখনই অনেক উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে কাজে লাগানো যায়।

২. বিদ্যালয় গমনের বর্তমান অবস্থা ধরে রাখার জন্য এলাকাসমূহে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। সরকারি উদ্যোগে এসব বিদ্যালয় স্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় যদি সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সংগঠন বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে। নতুন বিদ্যালয়গুলো বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে কিছু শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। যেমন- একই শ্রেণিতে দু'জন শিক্ষক নিয়োগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের সময় নির্ধারণে অভিভাবকদের মতামত নেওয়া, খাতা, কলম ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান প্রভৃতি।

৩. শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া একটা বড় সমস্যা। শিশুদের বিদ্যালয়ে টিকে না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ দরিদ্রতা। এজন্য দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ক. এলাকাসমূহে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মসূচির ফলে যেন শিশু শ্রম বেড়ে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

খ. যথাযথ বয়সে (৬ বছর) শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো দরকার। এজন্য জন্ম নিবন্ধনকরণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা দরকার।

গ. বিদ্যালয়গুলোকে শিশুবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দরকার।

ঘ. বর্তমানে কর্মরত মিশনারি বিদ্যালয়গুলোকে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে খাবার সরবরাহ করা যেতে পারে। মায়েদের দল তৈরি করে খাবার তৈরি করে খাবার বিতরণে তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। জামালপুরসহ অন্যান্য এলাকায় পরিচালিত এ ধরনের কর্মকান্ড থেকেও অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে।

৪. মেয়েদের প্রতি বৈষম্য হ্রাসে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। গবেষণা এলাকার মেয়েরা কম সংখ্যায় বিদ্যালয়ে যাচ্ছে এবং বেশি সংখ্যায় কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। সফল দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি মেয়েদের কাজ থেকে নিবৃত্ত করে বিদ্যালয়মুখী করতে পারে।

৫. পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগুলোর সার্বিক বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে পৃথক বরাদ্দ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, কোনো জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন এবং এর স্থায়িত্ব সেই জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীভুক্ত জনসাধারণ, চা-বাগানবাসীসহ অন্যান্য পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের আরও যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এদেরকে জাতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করে বিষয়টিকে আরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র : সিইএফ প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণাপত্র

চাকমা জাতিসত্তার বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজ নিজ নিয়মে বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পালন করে। ত্রিপুরা জাতিসত্তার বৈসুক উৎসব, মারমা জাতিসত্তার সাংগ্রাই এবং চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা জাতিসত্তার বিঝু বা বিষু উৎসবের প্রথম তিন অক্ষর নিয়ে বৈসাবি উৎসব নামকরণ করা হয়। বৈসাবিকে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের নববর্ষের আনুষ্ঠানিক নাম। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ২০০৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি'র নাম পরিবর্তন করে বিঝু নামে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জাতিসত্তার বর্ষবিদায় এবং বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে তিন দিনব্যাপী বিঝু উৎসব উদযাপন করে। এই তিনদিন চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল প্রাণী হত্যা করে না। এ সময় ঘরে ঘরে নানান পদের সুস্বাদু খাদ্য রান্না হয়। এ তিন দিন চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ছুটি ভোগ করে।

বিঝু উৎসবের প্রথম দিন ৩০ চৈত্র পালিত হয় ফুল বিঝু। চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফুল বিঝু পালন করে। জলদেবীকে শান্ত করতে নদীর ঘাটে কেউ কেউ পূজা করে। চাকমা তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, এমনকী নব দম্পতিরা নদী থেকে পানি এনে প্রবীণ স্বজনদের স্নান করিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। রাতে প্রদীপ পূজা করে। ফুল বিঝুর দিন চাকমা ছেলেমেয়েরা একে অন্যের গৃহপালিত পশু-পাখিকে খাদ্য-শস্য খাওয়ানোর মাধ্যমে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে।

মূল বিঝু উদযাপিত হয় ৩১ চৈত্র। চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল এদিনকে বিঝু উৎসবের প্রধান দিবস হিসাবে বিবেচনা করে। এদিন প্রতি ঘরে থাকে নানান পদের খাদ্যসম্ভার। কমপক্ষে পাঁচ রকমের তরকারি ছাড়াও নাড়ু, বিনি ভাত, মিষ্টান্ন এবং বিশেষ ধরনের পাচন প্রায় সকল চাকমা পরিবারের খাদ্য তালিকায় থাকে। সকাল থেকে এই খাওয়ার ধুম লেগে থাকে। কাউকে দাওয়াত করতে হয় না। চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে খাওয়া-দাওয়া এবং নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পুরাতন বছরকে বিদায় জানায়।

নতুন বছরের প্রথম দিনকে চাকমা জাতিসত্তার লোকসকল বলে গচ্ছে গচ্ছে দিন। চাকমা ভাষায় গচ্ছে গচ্ছে শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গড়াগড়ি। গত দু'দিনের অতিরিক্ত ভুরিভোজ এবং মদপানের পর এদিনটি বিশ্রামের দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্রামের সময় সমমনারা নানান খোশগল্পে মেতে ওঠে। এদিন সাধারণত প্রবীণ স্বজনদের যত্ন করে খাওয়ানোর রেওয়াজ আছে। এভাবেই চাকমা জাতিসত্তা গোষ্ঠী নতুন বছরকে স্বাগত জানায়।

বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে চাকমা নারীরা

অপরাপর আদিবাসী লোকসকলের মতো পার্বত্য আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ এবং বর্ষবিদায়ের অনুষ্ঠান আদিকাল থেকেই সর্বজনীন। আদিবাসী লোকসকলের অংশগ্রহণে এই সর্বজনীন লৌকিক চৈতন্য বিকশিত হয়। এর ফলে আদিবাসী লোকসকল আর একবার একতার বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়। যদিও আদিবাসীদের দুঃখের দিনের শুরুর সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের দিনও কমে আসছে।

কুমার প্রীতীশ বল

মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষা শিক্ষার প্রসার কেন

প্রথম ৬ থেকে ৮ বছরের শিশুদের কেন মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া করানো উচিত?

শিশুরা তাদের মাতৃভাষা আগে থেকে জানে। তারা বাড়িতে মাতৃভাষায় কথা বলে। তাদের প্রত্যেকটি চাহিদা তারা মাতৃভাষাতেই বোঝায়। সেজন্য যখন শিশুরা বিদ্যালয়ে যায়, তখন তাদের মাতৃভাষাতেই শিক্ষা শুরু করা উচিত। কেন না তারা এই ভাষা সহজভাবে বলতে পারে। প্রচলিত ব্যাকরণও জেনে যায়, সাধারণ দরকারি বিষয়ও তারা মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারে। শিশুরা প্রথম কয়েক বছর বিদ্যালয়ে এই ভাষায় পড়লে, এই ভাষায় কথা বললে তারা বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে।

কিন্তু মাতাপিতারা চান শিশুরা দেশের প্রধান ভাষা এবং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করুক।

যদি শিশুরা কয়েক বছর ধরে মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ে তাহলে তারা ইংরেজি শিখবে কীভাবে?

কথা হচ্ছে একটি শিশু একবারই নিজের জীবনে লিখতে বা পড়তে শেখে। সুতরাং তাদের জন্য প্রাথমিক ভাষাটাই সুবিধাজনক। মাতৃভাষার সঙ্গে প্রধান ভাষাকেও যোগ করলে (যেমন ইংরেজি) তা সহজবোধ্য হতে পারে। যখন শিশুরা শোনা এবং বলার সম্পর্ককে বুঝতে পারে, লেখা এবং পড়ার পদ্ধতিটাও রপ্ত করে, তখন তারা মাতৃভাষা দিয়ে অন্য ভাষাকে অনুসরণ করতে অসুবিধা বোধ করে না। যখন শিশুরা মাতৃভাষায় না দেখা বিষয়ে শিখতে আরম্ভ করে তখন নতুন স্তরের কিছু শিখতে চায়, অন্যভাষার নতুন নতুন শব্দ অনুধাবন করে যে বিষয়ে ওরা ইতোমধ্যেই অবগত আছে।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ৪০ বছর ধরে শিশুদের দ্বিভাষী ও বহুভাষী ভাষা শিক্ষার সক্ষমতা, শিক্ষার উন্নতি ও বুদ্ধিমত্তার বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। যখন শিশুরা দুই বা তিন ভাষার উপর উন্নতিমূলক শিক্ষার দখল নেয়, তখন প্রাথমিক শিক্ষা ও পরবর্তী উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে তারা ভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং কীভাবে সেটা কাজে লাগাবে তার চেষ্টা করে। বাস্তবিকভাবে তারা বেশি ভাষা ব্যবহারে পারদর্শী হয় এবং বিভিন্ন ভাষাকে তুলনামূলকভাবে বিচার করা ও বিপরীতভাবে দেখার ক্ষমতা রাখে।

সত্যি কথা বলতে গেলে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিশুরা যেভাবে মাতৃভাষা বা বাড়িতে সাধারণ কথোপকথন করে সমাজে সেটা প্রধান ভাষা থেকে আলাদা হয়। শিশুদের উচিত দ্বি-ভাষা বা বহু ভাষার কথা মাথায় রেখে নিজেদের মাতৃভাষাকে উন্নত করা। যাই হোক, সেটা তখনই সম্ভব যখন বিদ্যালয় গুলোতে মাতৃভাষার ওপর সঠিক উন্নতিমূলক প্রয়োগ বা ব্যবহার হবে। সাক্ষরতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে যদি বিদ্যালয়গুলো সঠিক শিক্ষা দিতে না পারে তাহলে শিশুরা না মাতৃভাষা না বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় পারদর্শী হতে পারবে।

তথ্যসূত্র : National Multilingual Resource Centre নিউজলেটার-স্বর, দিল্লী

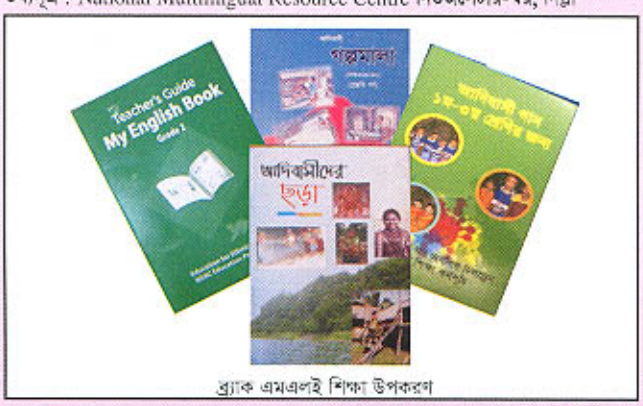

ব্র্যাক এমএলই শিক্ষা উপকরণ

আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা: আমাদের করণীয় বিষয়ক আঞ্চলিক সেমিনার

গত ২৩ জুন ২০১৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোলের আদিবাসী কালচারাল একাডেমী মিলনায়তনে আদিবাসী বিষয়ক জাতীয় কোয়ালিশন (NCIP)-এর উদ্যোগে এবং গণসাক্ষরতা অভিযান (CAMPE) এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ (RDC)-এর সহযোগিতায় *আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা: আমাদের করণীয়* বিষয়ক একটি আঞ্চলিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও NCIP-এর সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর মেসবাহ কামাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্ব অনুধাবন সেই সাথে বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রমে আদিবাসী শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সকলের আগ্রহ বাড়ানো ও বাস্তবায়ন তরান্বিত করা। প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান। সমাপনী অধিবেশনে সভাপ্রধান ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মিজ প্রতিমা রানী রাজোয়ার। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য মোঃ গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাদের, নাচোল উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, মজিবুর রহমান প্রমুখ। দিনব্যাপী আঞ্চলিক সেমিনারে রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট-এর NCIP-এর প্রতিনিধিসহ আদিবাসীর মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে ব্র্যাক ও কারিতাসসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনার সঞ্চালনা করেন RDC- এর সাধারণ সম্পাদক এবং NCIP-এর কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য জান্নাত-এ-ফেরদৌসী।

এমএলই বিষয়ক উপর্যুক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ বিশেষ সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলো-

- প্রথম পর্যায়ে সাঁওতাল ভাষায় মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যায়নি। দ্বিতীয় দফায় সাঁওতালী ভাষা অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। বাংলা ও রোমান হরফ দুইটাকেই নিয়ে দু'হরফেই শিক্ষা উপকরণ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ওঁরাওদের মূল ভাষা কুরুক। কুরুক ভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
- আদিবাসী শিশুদের জন্য নিজামপুরের জামিনকমিন গ্রাম, কার্তিকপুর, ধরইল এবং শ্যামপুরে প্রাথমিক স্কুল এবং মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন প্রয়োজন।
- সমতলের আদিবাসীদের অন্যান্য ভাষাগুলো নিয়ে আঞ্চলিক ভাষা বিষয়ক সংলাপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তনুজা শর্মা

ক্যামেলির আনন্দ লেখাপড়াতে

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলা হতে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অক্ষয়মুনি কার্বারী গ্রামে ক্যামেলি ও তার

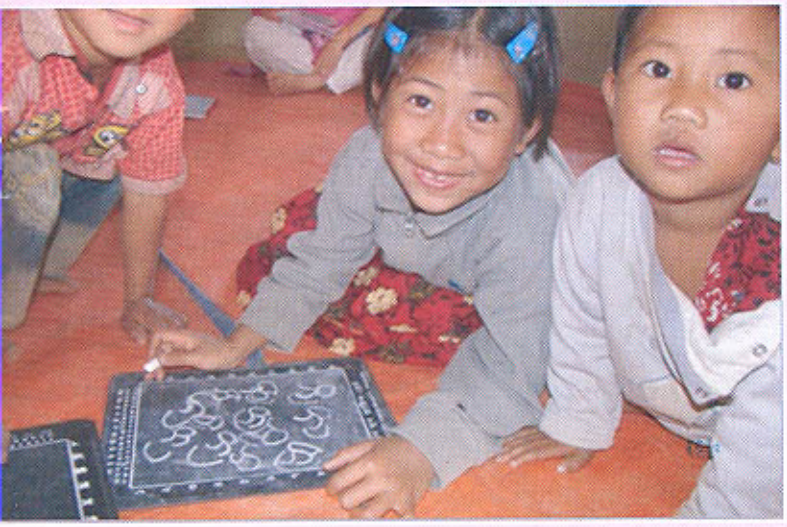

পরিবার বসবাস করে। অধিকাংশ দিন ক্যামেলির বাবা-মা বনে জ্বালানী এবং বন্য সবজি সংগ্রহ করতে যায়। স্কুলে না গেলে ক্যামেলি বাবা-মার সঙ্গে বনে যায়। অন্যসময় ক্যামেলি পড়ালেখার পাশাপাশি বাবা-মা না থাকলে ছোট বোন তৃপ্তির দেখা শুনা করে। সেভ দ্য চিলড্রেন-এর শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত অক্ষয়মুনি কার্বারী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের আগে এখানে কোনো স্কুল ছিল না। দূরবর্তী কোনো স্কুলে যাবার সুযোগও ছিল না। তাই স্কুলে যেতে পারত না। এখন প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পাশাপাশি সে তার বাবা-মাকে বাড়ির কাজে সহায়তা করতে পারে।

ক্যামেলি তার অনুভূতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে, আমি প্রতিদিন স্কুলে আসি। আমার দিদিমনি আমাদের গান, ছড়া এবং মাতৃভাষায় পড়ান। আমি স্কুলের প্রত্যেকটি কাজে খুব আনন্দ পাই, বিশেষ করে কর্ণার খেলা খুব ভালো লাগে।

ক্যামেলির মা কাজের জন্য বাসার বাইরে গেলে সে ছোট বোন তৃপ্তিকে স্কুলে নিয়ে আসে। বড়বোন হওয়ার কারণে ছোটবোনকে দেখাশোনা করতে হয়। তারপরও সে চেষ্টা করে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার। ছোটবোন তৃপ্তি তিন বছর বয়সের হলেও সে অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে এবং কর্ণার খেলা খেলতে আনন্দ পায়। ক্যামেলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার শিক্ষক লিসা বলেন, কীভাবে একজন ভালো শিক্ষক হওয়া যায় তা ক্যামেলি জানতে চায়। সে মাতৃভাষায় আরও উচুঁ শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে চায়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ক্যামেলি মূলধারার স্কুলে পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী বাংলায় কথা বলেন না। তাদের মধ্যে অনেকে প্রথম বাংলা শুনতে পায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে অথবা কখনও শহরে এলে। অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর শিশুরা বাংলা ভাষাকে বিদেশী ভাষা মনে করে। এই ভাষা শেখার জন্য তারা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে। এ চেষ্টায় ব্যর্থ হলে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে লেখাপড়া থেকে সরে আসে। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঝরে পড়ার হার বেশি।

সেভ দ্য চিলড্রেন এর শিশুর ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এলাকার জনগণ এবং নেতৃস্থানীয়দের সম্পৃক্ত করে উপকরণ তৈরি করে। অন্যদিকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার উপর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। মূলধারার শিক্ষা গ্রহণের জন্য ধীরে ধীরে শিশুদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, ফলে শিশু ঝরে পড়ার হার কমে আসে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্কুলগুলো কমিউনিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে শুধু ভাষার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, পাশাপাশি তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

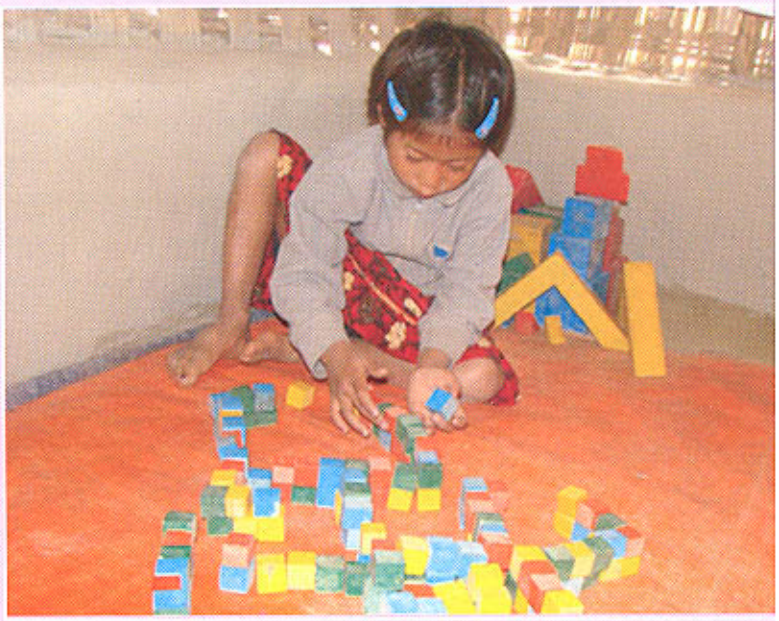

ক্যামেলি ও তার বোন একটি মজবুত ভিত্তির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। ভবিষ্যতে হয়ত ক্যামেলি একদিন শিক্ষক হিসেবে এই স্কুলে পাঠদান করবে। নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে নেতৃত্ব দেবে।

মেহেরুন্নাহার স্বপ্না

মণিপুরী ভাষা

ভানুবিল মণিপুরী কৃষকপ্রজা আন্দোলন

বাংলাদেশে মণিপুরী বসতির হাবিৎত ডাঙর ভানুবিল লয়া অগ পড়িছেতা মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নগৎ। ব্রিটিশ সরকারের বলনো পাংকালপা জমিদার আগর তালুকএগৎ খাজানানো আক্রোশহান বাড়িল। জমিদারর নায়েবগই নিয়মহান করিয়া খাজানা নিলেগাউ রসিদ নাদলো। সিদাসাদা মণিপুরী খেতুয়াল অতাই বিষয়এহান হান্নাপেইলা। নায়েবআগর চালাকিনো খাজনা বাকি আছে বুলিয়া জমিদারে কেইস দিলোগা আরো তাঙর হুস হমেইল। তাঙি কান্থিহানে সভাআহাৎ এক ইয়া খাজনা দেনা বন্ধ করলা। জমিদারে আপোষ আহান করানির কাজে পঞ্চানন ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ শর্মা এসারে সমাজর মুরুব্বী কতগরে বৈঠক ডাকলো। তাঙরাংত য়্যাথাং নাপেয়া আস্তাদিনহান কয়েদগৎ আটকেয়া থয়া মারপিট করল। কয়েদখানাগৎত পলিয়া আহিয়া তাঙি লালফামর ডাক দিলা। ভানুবিলর পিছর লপুকে মাইর আহাৎ নায়েব অগ মরিল।

জমিদারর চক্রান্ত বারো অত্যাচারহান আরতাউ জবর ইল। ১৯৩০ ইংরেজিৎ খাজানা কিয়ারে দেড় টাকাৎত আড়াই টাকা কাকরেয়িলা বারো রুকর শপা সেদানি, পহুরি খুলানি বন্ধ করেয়িলা। খেতির ফৌদক বারো শপার ফলৌ জমিদারর মানুয়ে নিলাগা। মণিপুরীর দাবিৎ য়াথাং দিয়া সিলেট জেলা কংগ্রেস মণিপুরী খেতিয়ালার লালফাম এহাৎ হাবিবারাদে পাংলাক করানির সিদ্ধান্ত নিলাগা। এমতাগা মণিপুরী খেতিয়ালা প্রজার লালফাম বারো ভারতর স্বাধীনতা লালফাম একাকার ইয়া নুয়া রূপআহান নিলগা।

আন্দোলন এহাৎ নেতৃত্ব দিলাতা বৈকুণ্ঠ শর্মা, গিরিন্দ্র সিংহ, রূপচাঁন সিংহ বারো কৃষ্ণমনি শর্মা। জেলেইর নেতাগ আছিলি লীলাবতী শর্মা। জেলেইরে এক করিয়া মিছিলে নেতৃত্ব দিয়া তেই লালফামর পাংকালহান বাড়ায়িল। মণিপুরীর গরে গরে আছে ঢাক-করতাল, মঞ্জিলা, মইবং। গর বাগাৎ আহিলে অতা বাজিয়া আত্তির দাপাহানরে তালকরলা।

স্বাধীনতার লালফামে য়ৌয়িয়া দাপা দাপা মণিপুরী এ্যারেস্ট ইলা। কলিকাতা বারো আরতাউ ডাঙর ডাঙর টাউনে মণিপুরী প্রজা-আন্দোলনর সমর্থনে সভা ইল। লালফামর পৌএহান দেশগাঙ লালুয়া বিলাতে ফৌয়িলগা। লেবার পার্টিয়ে কমন্স সভাৎ লালফাম এহার তদন্ত দাবি করানিয়ে মিস উইলকিন্সনর ঠৌরাঙে তিন সদস্যর তদন্তটিম আহান ভানুবিলে মণিপুরী খেতিয়ালার অবস্থাহান চেয়া গেলাগা।

১৯৩৫ ইংরেজিৎ নুয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা দেনার আগে রাজনৈতিক বন্দীঅতারে মুক্তি দিলা। আসাম প্রাদেশিক পরিষদে সরকাররের উদ্যোগে শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন পাস ইলে ভানুবিলর মণিপুরী খেতিয়ালার অধিকার স্বীকৃতি পেইলো।

অধ্যাপক রণজিত সিংহ

বাংলা ভাষা

ভানুবিল মণিপুরী কৃষকপ্রজা আন্দোলন

বাংলাদেশে মণিপুরী বসতির বৃহত্তম এলাকা ভানুবিল। ভানুবিল মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ব্রিটিশ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট জমিদারের সঙ্গে এ তালুকের খাজনা নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। জমিদারের নায়েব নিয়মিত খাজনা নিলেও রসিদ দিতেন না। সহজ-সরল মণিপুরীরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি নায়েবের চালাকিতে খাজনা বাকি আছে বলে জমিদার মামলা করলে তারা সব বুঝতে পারে। ক্ষোভে দুঃখে তারা খাজনা বন্ধ করল।

আপোসে যাবার জন্য জমিদার পঞ্চানন ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ শর্মাসহ কয়েকজন মুরুব্বিকে ডাকলেন। কথা মেনে না নেওয়ায় জমিদার তাদের সারা দিন কয়েদখানায় বন্দী করে রেখে নির্যাতন করলেন। কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসে তারা আন্দোলনের ডাক দেয়। এরপর ভানুবিলের পশ্চিম মাঠে সংঘর্ষে নায়েব নিহত হয়।

জমিদারের নিপীড়নমূলক চক্রান্ত বাড়তে থাকে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে জমির খাজনা কিয়ার প্রতি দেড় টাকা থেকে আড়াই টাকা বাড়ানো হলো। বন্ধ করে দেওয়া হলো গাছকাটা, পুকুর খনন করার সব অধিকার। কৃষি ফসলও জমিদারের লোক কেড়ে নিতে শুরু করে। মণিপুরীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে সিলেট জেলা কংগ্রেস মণিপুরী কৃষক-আন্দোলনে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। এবার মণিপুরী কৃষক আন্দোলন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন একাকার হয়ে নতুন রূপ নেয়।

আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বৈকুণ্ঠ শর্মা, গিরিন্দ্র সিংহ, রূপচান সিংহ ও কৃষ্ণমণি শর্মা। লীলাবতী শর্মা মণিপুরী নারীনেত্রী ছিলেন। নারীদের একত্র করে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি আন্দোলনের শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আন্দোলনকারীদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হলো। এ সময় কলকাতাসহ বড় বড় শহরে মণিপুরী প্রজা-আন্দোলনের সমর্থনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের খবর দেশের সীমানা পেরিয়ে বিলেতে পৌঁছাল। লেবার পার্টি কমন্স সভায় আন্দোলনের তদন্ত দাবি করলে মিস উইলকিন্সনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি ভানুবিলে মণিপুরী কৃষকের অবস্থা সরেজমিনে দেখতে আসেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণার আগে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সরকারের উদ্যোগে আসাম প্রাদেশিক পরিষদে শ্রীহট্ট প্রজাস্বত্ব আইন পাস হলে ভানুবিলের মণিপুরী কৃষকের অধিকার স্বীকৃতি পায়।

জ্যোতি সিনহা

আদিবাসী শিশুদের জন্য ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম

বাংলাদেশে ব্র্যাকের যাত্রা ১৯৭২ সালে ত্রাণ, পুনর্বাসন ও দেশগড়ার প্রত্যয় নিয়ে হলেও ১৯৮৫ সাল থেকে এই সংস্থা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের বাবা-মার সঙ্গে ব্যবহৃত ভাষা এবং বিদ্যালয়ের বই, শিক্ষক ও সহপাঠীর ভাষার মধ্যে কোনো মিল নেই। ফলে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে। মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা উভয় ভাষাতে দক্ষতা বৃদ্ধি না হওয়ায় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা শিক্ষাজীবন শেষের আগে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এই সমস্যা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে ব্র্যাক ২০০১ সালে আদিবাসী শিশুদের জন্য পৃথক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করে।

গারো স্কুলের ২ জন শিক্ষক

কর্মসূচি বাস্তবায়ন

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা নামে ২০০৩ সালে শুরু হয় প্রথম কর্মসূচি। এ কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিক্ষণ-শিখন হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি শ্রেণিভিত্তিক আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনবোধ ও সংস্কৃতিভিত্তিক সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হয়। ২০০৮ সালে চাকমা শিশুদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা নামে অপর একটি কর্মসূচি চালু হয়। এখানে শিক্ষণ-শিখন নির্দেশনা হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহারের পাশাপাশি শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চাকমা ভাষায় উন্নয়নকৃত বই ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসশনের মাধ্যমে উপকরণের চাহিদা নিরূপণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বিভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনবোধ ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ উপকরণ ব্যবহার করে আদিবাসী তথ্যাভিজ্ঞদের মাধ্যমে শিশুদের উপযোগী সম্পূরক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। এসব উপকরণে আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনবোধ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীকালে তা আঞ্চলিক কর্মশালার মাধ্যমে কমিউনিটি রিসোর্স পারসনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরামর্শকের সহায়তায় জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে মাতৃভাষা ও স্কুলের পাঠ্যভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন নিশ্চিতকরণের জন্য শ্রেণিভিত্তিক সহায়ক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।

নিজ নিজ সংস্কৃতি ধরে রাখার মানসিকতা তৈরি করতে নাচ, গান, ছড়া, গল্প বলা, ছবি আঁকা, অভিনয় চর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি আদিবাসী গানের বই তৈরি করা হয়েছে।

আদিবাসী সাক্ষর জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মসূচিতে গতিশীলতা আনতে ব্র্যাকের কর্মী ও শিক্ষক নিয়োগের শর্তসমূহ শিথিল করে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হচ্ছে। আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষায় সহযোগিতার জন্য যে স্কুলে দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী আছে সেসব স্কুলে সম্প্রদায়ভিত্তিক ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন।

অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে আদিবাসীদের সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক ধারণা তৈরির পাশাপাশি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

কর্মসূচির বিস্তৃতিতে সমগ্র আদিবাসী এলাকাকে ৪টি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম। বর্তমানে ৫৬টি আদিবাসী জাতিসত্তার ছেলেমেয়ে ব্র্যাক আদিবাসী স্কুলে লেখাপড়া করছে। বিভিন্ন গবেষকদের মাধ্যমে আদিবাসী শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেছে।

প্রশিক্ষণ

বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) কার্যক্রমে ১১ দিনের ভাষা প্রশিক্ষণ, ১১ দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টশন ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত কর্মী, ম্যানেজার, মনিটর ও প্রশিক্ষকদের আদিবাসী বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ, বিশেষ ওরিয়েন্টেশন, কর্মশালা ও রিফ্রেশার কোর্স প্রদান করা হয়।

তপন আচার্য্য

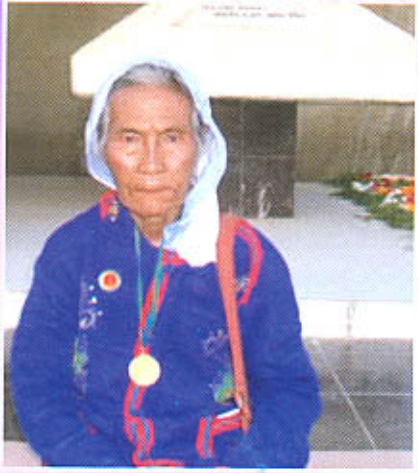

আদিবাসী বীরপ্রতীক কাকাত হেনইঞ্চিতা (কাকন বিবি)

কাকাত হেনইঞ্চিতা ওরফে কাকন বিবি মুক্তিযুদ্ধ বিজয়ী আটপৌড়ে এক গ্রামীণ পাহাড়ি খাসিয়া নারী। আদিবাসী এই নারীর অস্ত্র হাতে সম্মুখ যুদ্ধের বীরোচিত ভূমিকা এখনও সহযোদ্ধাদের মুখে মুখে শোনা যায়।

কাকন বিবির মূল বাড়ি ছিল ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। ১৯৭০ সালে তার বিয়ে হয় দিরাই উপজেলার শহীদ আলীর সঙ্গে। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় স্বামী শহিদ আলীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। পরের বছর ইপিআর সৈনিক মজিদ খাঁনকে বিয়ে করেন। তিনি সিলেট ইপিআর ক্যাম্পে চাকরি করতেন। বিয়ের কিছুদিন পর মেয়েকে আনতে দিরাই যান। তারপর সিলেট ফিরে স্বামী মজিদ খাঁনকে আর খুঁজে পাননি। স্বামী দোয়ারা বাজার সীমান্ত এলাকায় কোনো এক ক্যাম্পে বদলি হয়েছেন।

কাকন বিবি সিলেট থেকে দোয়ারাবাজার সীমান্তে আসেন। তখন ছিল ১৯৭১ সালের জুন মাস। পাকবাহিনীর সঙ্গে ওই সীমান্ত অঞ্চলে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। শিশুকন্যাকে একজনের আশ্রয়ে রেখে দোয়ারা বাজারের টেংরাটিলা ক্যাম্পে স্বামীর খোঁজে যান। এখানে পাকবাহিনীর নজর পড়ে তার উপর। পাকবাহিনী তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় ব্যাঙ্কারে। ব্যাঙ্কারে রেখে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করে। পাকবাহিনী ও স্থানীয় রাজাকাররা অমানুষিক নির্যাতনের পর তাকে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনায় বদলে যান কাকন বিবি।

কাকন বিবি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী তাঁকে সেক্টর কমান্ডার লেফট্যানেন্ট কর্ণেল মীর শওকত আলী-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মীর শওকত তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাকে বিশ্বস্থ গুপ্তচরের দায়িত্ব দেন। কাকন বিবি সাহসিকতার সঙ্গে বিভিন্ন বেশে ঘুরে ঘুরে পাকবাহিনীর খবর পৌছে দিতেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে। সেই খবর পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা এ্যাকশনে নামতেন।

কাকন বিবি গুপ্তচরের কাজ করতে গিয়ে দোয়ারা বাজার উপজেলার বাংলাবাজারে পাকবাহিনীর হাতে আবার ধরা পড়েন । তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে একনাগাড়ে সাত দিন বিবস্ত্র করে অমানুষিক নির্যাতন চালায় পাক হানাদার-রাজাকার আলবদর। লোহার রড গরম করে ছ্যাঁকা দেয়। অমানুষিক নির্যাতনে অজ্ঞান হয়ে গেলে পাকবাহিনী মৃত ভেবে ফেলে রেখে যায়। বালাট সাব সেক্টরে চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে আবার বাংলাবাজার ফিরে আসেন। এবার তিনি মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলীর কাছে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। রহমত আলীর দলে সদস্য হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম টেংরা টিলায় পাকসেনাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই যুদ্ধে কয়েকটি গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হয়। উরুতে গুলির দাগ এখনও আছে। এখনো অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ব্যথা হয়। টেংরাটিলা যুদ্ধের পর আমবাড়ি, বাংলাবাজার, টেবলাই, বালিউরা, মহব্বতপুর, বেতুরা, দূর্বিনটিলা, আধারটিলাসহ প্রায় ৯টি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি রহমত আলীসহ আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে সুনামগঞ্জ সিলেট সড়কের জাউয়া ব্রীজ অপারেশনে যান। ব্রীজ অপারেশনে তারা সফল হন। আমবাড়ি বাজার যুদ্ধে আবার তার পায়ে গুলি লাগে।

কাকন বিবি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। ১৯৯৬ সালে সাংবাদিক রণেন্দ্র তালুকদার পিংকু তাঁকে ভিক্ষারত অবস্থায় আবিষ্কার করেন। কাকন বিবির খবর সংবাদপত্রে আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে এক একর খাস জমি প্রদান করেন এবং তাঁকে বীরপ্রতীক উপাধি দেন। সিলেটের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান ঐ জায়গার উপর একটি ঘর নির্মাণ করে দেন। এই সাহসী আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধাকে ২০১০ সালে *দৈনিক জনকণ্ঠ* সম্মাননা দেয়। জনতা ব্যাংক ২০১০ সালে তাঁকে ১৫ লক্ষ টাকার একটি এফডিআর করে দেওয়ার পাশাপাশি একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়। ২০০৬ সালে ভারতের সেনাবাহিনী কাকন বিবিকে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করে।

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা কাকাত হেনইঞ্চিতা (কাকন বিবি) বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলার ঝিরাগাঁও গ্রামে বসবাস করছেন। এক সময়ের পাহাড়ি এই নারীর যৌবনের সেই চঞ্চলতা এখন নেই। একাত্তরের এই আদিবাসী বীর নারী এখন বয়সের ভারে ন্যুব্জ ও রোগে কাতর।

কুমার প্রীতীশ বল
তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার **পহর** প্রকাশিত হলো। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

European Union

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর সহায়তায় **গণসাক্ষরতা অভিযান**
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.camebd.org